[illegible]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

প্রকাশক
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়
২০ নং জোড়াপুকুর লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য ৫০ আনা।

কলিকাতা,
উইলিয়মস্ লেন, ৪ নং ভবনস্থ
দাস যন্ত্রে,
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

'সাগর-সঙ্গীতে'র কবি

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ,

বার-এট্-ল, শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়,

আপনি বড় ব্যারিষ্টার, বা বড় কবি বলিয়া যে আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা নহে —আমি মুগ্ধ হইয়াছি আপনার হৃদয়-মাহাত্ম্য দেখিয়া। আপনার জীবন-ঘটনায় আপনার যে ত্যাগ, যে সাহস ও যে হৃদয়বত্তার পরিচয় পাইয়াছি, বাঙ্গালী-জীবনে তাহা দুর্লভ।

আজি ভক্তি-শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ এই গ্রন্থখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিলাম।

গুণমুগ্ধ

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

'নানা মুনির নানা মত' কথাটা এদেশে অনেক কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এক মুনিরও যে নানা মত হয়, তাহা বোধ করি কেহ কখনও শুনেন নাই আশা হয়, এবারে অনেকে সে কথা শুনিতে পাইবেন, এবং এই 'রবিয়ানা' পাঠে তাহা বিশ্বাসও করিবেন।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'মত নিতুই নব' 'তাঁহার নিকট আজ যাহা 'হাঁ' কাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যনীতি প্রভৃতি সকল রকম নীতিতেই কবিবরের মত নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে।'—এই সকল কথাই এই পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও বলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্তগণ অবশ্য তাঁহার ঐ বিষম দোষটাকে বিশেষ গুণ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতের যুক্তি এই যে, 'মানুষের কি কখনও মত পরিবর্ত্তন হয় না?'—হয় বৈ কি!—কে তাহা অস্বীকার করে? মানুষেরই ভ্রম হয়, আবার মানুষেই তাহা সংশোধন করে। অতএব মত-পরিবর্ত্তন ত মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রবীন্দ্রনাথের মতন এই মিনিটে-মিনিটে মত-

পরিবর্ত্তন কি জগতে কাহারও ঘটিয়াছে ?—এরূপ ডিগ্‌বাজী খাওয়াটা কি মানুষের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা ?

উচ্ছ্বাসের মুখে কবি তাঁহার কবিতা বা গাথায় যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, আমরা তাহাতে বাও্‌নিষ্পত্তি করিব না। কিন্তু সমাজ-ক্ষেত্রে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কবি যদি উচ্ছ্বাসকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া, উপমাকে সম্বল করিয়া যুক্তি-তর্কের মস্তকে বারংবার পদাঘাত করেন, তবে সেটা সহ্য করা,—উপেক্ষা করা পাপ।—পাপ এই হিসাবে যে তাহাতে দেশের সবিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। প্রধানতঃ সেই ক্ষতির কথা মনে করিয়াই এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম।

এই পুস্তকের নামকরণের জন্য আমি পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের নিকট ঋণী।—এ কারণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই অবসরে আর দুইজন অগ্রজপ্রতিম সুহৃদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। একজন—'অর্চনা'র সর্ব্বস্ব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্র, এবং অন্যজন 'বাঙ্গালী'পত্রের সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন। এই দুই মহাশয় নানা বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা,
৬শে শ্রাবণ, ১৩২৩

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র ।

কবিতায় 'গন্ধ'	১
বাস্তব	১১
কঠোর সমালোচনা	২৩
সদুপায়	৩১
অভিভাষণ	৪৫
সমাজ-সংস্কার	[illegible]
কঠোর সমালোচনা (পরিশিষ্ট) ...	৭৩
বিবিধ	
কবি-জীবনী	৭৫
সীতাদেবী	৭৭
রামচন্দ্র	৮০
হিন্দু সভ্যতা	৮২
ইতিহাস	৮৩

[illegible]

কবিতায় 'গন্ধ'

আমাদের দেশে একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শ্লোক আছে,—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা

কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভেতি —

কিন্তু কবিত্বশক্তি যে সুদুর্লভ, একথা অনেকেই এখন মানিতে চাহেন না। কিছু দিন হইতে এই দেশের লোকেই কবিতার ও হেঁয়ালীর ব্যবধান মুছিয়া ফেলিয়া ঐ শক্তিটাকে অতি সুলভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চেষ্টা অবশ্য তাঁহাদের মধ্যেই বেশী চলিতেছে, যাঁহাদের রচনায় হেঁয়ালীর অংশই অধিক

তবে সমালোচনা-ছলে দুই চারি জন লেখকও যে ঐ হেঁয়ালী-সর্ব্বস্ব কবিতার সমর্থন না করিতেছেন, এমন নহে; কিন্তু তাঁহাদের কথা ধরি না। কারণ, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহার অধিকাংশই মুখস্থ কথা এমন কি, তাঁহাদের

অনেককেই দেখিয়াছি, তাঁহারা কি বলিতেছেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই জানেন না —নিজেদের বুদ্ধির দুয়ারে চাবি দিয়া রবীন্দ্রনাথের কথাগুলাই তাঁহারা কেবল কপ্-চাইয়া যান মাত্র

এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই গুরু। অস্পষ্ট কবিতা-রচনায় 'নবীন কবিবরগণে'র প্রবৃত্তি পন্থানুসরণ ও উৎসাহ প্রধানতঃ তাঁহা হইতেই অতএব এই কবিতা-সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে তাঁহারই কথা ধরিয়া আলোচনা করা উচিত

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'র এক স্থলে লিখিতেছেন,—'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা দার্জ্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে এক জন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন আমার বোধ হয় না কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহ ত কবিতা লেখে না হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে বুঝিলাম না, তখন বিষম

খুঁজিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে কিছু বুঝিলাম না, তাহাকে এই কথা বলিতে হয় "ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ।"

কিন্তু ফুলের গন্ধের সহিত কবিতা বুঝা-না-বুঝা ব্যাপারের তুলনা করায় কি সার্থকতা হইয়াছে, বুঝিতে পারি না। এ ধোঁয়াটে ধরণের উপমা-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট না হইয়া আরও ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ফুলের গন্ধই হউক, আর তাহার সুন্দর আকৃতিই হউক, এ সমস্তই বহিরিন্দ্রিয়ের উপভোগের সামগ্রী। মনে রাখিতে হইবে, পুষ্পবিশেষের গন্ধ শুঁকিয়া বা তাহার শোভা দেখিয়া মনের সকল অবস্থাতেই কিছু একই ধরণের ভাবের উদয় হয় না। মানসিক অবস্থাভেদে একই পুষ্পের গন্ধে কখনও বা মনে দুঃখের তরঙ্গ উঠে, কখনও বা সুখের তরঙ্গ উঠে। কিন্তু কবিতা জিনিসটা মানুষেরই তৈয়ারী জিনিস। মানব-হৃদয় হইতে উহার উৎপত্তি এবং মানব-হৃদয়ের উপভোগের জন্যই উহার সৃষ্টি। সেই জন্য কবিতা নিজেই ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া মানব-মনে একটি মাত্র ভাবের উদ্রেক করে। যাহা দুঃখের কবিতা, তাহা চিরদিনই দুঃখের কবিতা। আর যাহা সুখের কবিতা,

তাহা চিরদিনই সুখের কবিতা   যা' তা' অনির্দ্দিষ্ট ভাবের উদ্রেক করাই যদি কবিতার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কোকিলের কুহুস্বরও কবিতার স্থান অধিকার করিত

কবিতা বুঝাইবার জন্য লিখিত না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে বুঝিবার জিনিস সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। প্রকৃতির Inteipretation অর্থাৎ ব্যাখ্যা দেওয়ারই নাম কলাবিদ্যা   কবিতা জিনিসটা সুকুমার কলাবিদ্যারই অন্তর্ভূত। অতএব কবিতার বুঝা-ব্যাপারটা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কবিতা কেবল শব্দ-রঞ্জিত চিত্রমাত্র নহে।

এটা আমাদের মনগড়া কথা বলিয়া কেহ ভাবিবেন না —রসজ্ঞমাত্রেই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের রচনায় যখন অর্থহীন কবিতার অংশ বেশী ছিল না, তখন তিনি নিজেই এই মতাবলম্বী ছিলেন। তখন তিনি কবিতা কাহাকে বলে, কবিতার উদ্দেশ্য কি, এবং তাহার অস্পষ্টতার কারণ প্রভৃতি বিষয় আমাদিগকে অন্যরূপ বুঝাইয়াছিলেন। আমরা নিজে বেশী কিছু না বলিয়া তাঁহার সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার আধুনিক মতের অসারতা প্রমাণ করিয়া দিতেছি।

গীতি-কাব্যসম্বন্ধে প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আমরা যাহাকে গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটি মাত্র ভাবের বিকাশ—ঐ যেমন বিদ্যাপতির—

'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর—
শূন্য মন্দির মোর',

সেও আমাদের মনের বহু দিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোন সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা-বাদলে ভাদ্র মাসে শূন্য ঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে—যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল, অমনি সকলেরই এই অনেক দিনের কথাটা মূর্ত্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।"

"একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোন লোকের অধিগম্য নহে; তেমন হইলে তাহাকে পাগ্‌লামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও হৃদয়ের মর্ম্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।"

পাঠকের বুঝাবুঝির উপরেই যে কবিতা-জন্মের সার্থকতা নির্ভর করে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ এইরূপ একবার নহে, বহুবার বহু প্রবন্ধে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন, "হৃদয়ের ধর্ম্মই এই, সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়।"

"গাছে ফল যে ক'টা ফলিয়া উঠে, তাহাদের এই দরবার হয় যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না আমরা পাকিয়া, রসে ভরিয়া, রঙে রাঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আঁটিতে শক্ত হইয়া গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব, সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের মনে ভাবনাগুলা ভাব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও সেই দরবার তাহারা বলে, কোন সুযোগে যদি হওয়া গেল, তবে একবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমি লাভ করিবার সুযোগ, এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়।"

'এই যে এক মনের ভাবনার আর এক মনের মধ্যে

সার্থকতা-লাভের চেষ্টা মানবসমাজ জুড়িয়া চলিতেছে, এই চেষ্টার বশে আমাদের ভাবগুলি এমন একটি আকার ধারণ করিতেছে, যাহাতে তাহারা ভাবুকের কেবল একলার না হয় ....এ কথা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোন বন্ধুর কাছে যখন কথা বলি, তখন কথা সেই বন্ধুর মনের ছাঁদে নিজেকে কিছু-না-কিছু গড়িয়া লয় ... বস্তুতঃ আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুই জনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে ”

রবীন্দ্রনাথ এইরূপ বহু প্রবন্ধে নানা রকমে বুঝাইয়াছিলেন যে, “একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে,—সাহিত্য দুই রকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয় এক সে সত্যকে মনোহর রূপে আমাদিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয় ....সেই জন্য যখন আমরা দেখি, একটা কথা কেহ অত্যন্ত চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তখন আমাদের এত আনন্দ হয়। প্রকাশের বাধা দূর হওয়াটাই আমাদের কাছে একটা দুর্মূল্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় ” আর “অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য্য ;—সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ

সেইখানে তত সৌন্দর্য্যের অভাব, ক্ষুতা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্ব্ব প্রকার অসামঞ্জস্য।"

কাব্যের প্রকাশ যে সুস্পষ্ট অর্থাৎ বুঝিবার মত হওয়াই উচিত এবং তাহার ব্যতিক্রমে যে কাব্যে দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা রবীন্দ্রনাথের উক্তির দ্বারাই বুঝাইয়া দিলাম এইবারে তাঁহার কথার দ্বারাই বুঝাইয়া দিব যে, কাব্যের প্রকাশ ধোঁয়াটে হয় কেন

ভাষার দীনতা ছাড়া কবিতায় অস্ফুটতা দোষ ঘটিবার প্রধানতঃ আরও দুইটী কারণ আছে একটী কারণ, — ভাবুক চিত্তে যে ভাবটী আকার ধারণ করিবার পূর্ণ অবকাশ পায় নাই, সেই ভাবকে আকার দান করিতে গেলেই তাহা অপরিস্ফুট হইয়া পড়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় উহাকে 'জালিয়াতের কল্পনা' বলা যাইতে পারে আর দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক দিন ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "এক মানুষের মধ্যে যেন দুটো মনুষ্য আছে, ভাবুক এবং লেখক। যে লোকটা ভাবে, সেই লোকটাই যে সব সময়ে লেখে তা ঠিক মনে হয় না লেখক-মনুষ্যটী ভাবুক মনুষ্যটীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী তিনি অনেক সময়ে অনবধানতা বশতঃ ভাবুকের ঠিক ভাবটা প্রকাশ

করেন না। আমি মনে করি, আমার যেটা বক্তব্য আমি সেটা ঠিক লিখে থাকি, এবং সকলের কাছেই সেটা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেচে, কিন্তু আমার যোগনী যে বড়ন্ পাশের বাস্তায় চলে গেছেন আমি হয় ত তা' জানতেও পারি নি।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির উত্তর দিতে গিয়া কি এখন আমরা অনুমানে ধরিতে পারি না যে, অস্পষ্ট কবিতার মধ্যে 'বৃহৎ আইডিয়া'র যে ভাণ করা হয়, সেটা শুধু ভাণ মাত্র? — তাহাতে সত্যের সম্পর্ক মাত্র নাই? আর বৃহৎ idea-র কবিতাই বা এমন কে কি লিখিয়াছেন যে, যাহা উচ্চতার হিসাবে রামপ্রসাদের গানের নিকটস্থ হইতে পারে? অথচ রামপ্রসাদকে বুঝিতে কি কাহারও কষ্টবোধ হয়? নায়ক-নায়িকার হৃদয়-রহস্যই বা এমন কে কি ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা শুধু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীর পায়ের তলায় আসন পাইতে পারে? অথচ তাঁহাদের তুল্য সহজ ভাষার কবি আর কেহ আছেন কি?

বাক্য এবং অর্থ উভয়েতেই যাহাতে প্রতিপত্তি হয়, সে জন্য মহাকবি কালিদাস পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার নব্য কালিদাসেরা অর্থ জিনি টাকে একেবারে গ্রাহ্যই করেন না। বাক্যই তাঁহাদের কবিতার

সর্ব্বস্ব তাই সে কবিতা এক কান দিয়া ঢুকিয়া অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যায় —মরমের সহিত সে কবিতার সম্পর্কমাত্র নাই সে কবিতা পড়িয়া Gifford সাহেবের কথাই মনে পড়ে—

Abortive thoughts, that right and wrong confound
Truth sacrificed to letters, sense to sound.
False glare, incongruous images combine,
And noise and nonsense clatter through the line.

আসল কথা, হো হো করিয়া মিথ্যাকে চাপা দেওয়া চলে না 'কবিতায় বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ' বলিয়া মেকী চালাইতে চেষ্টা করিলেও তাহা চলিবে না। লোকে এক-একটু করিয়া বুঝিতে শিখিতেছে যে, রবীন্দ্র-নাথের 'নিজের মধ্যে যে একটা গৃহবিচ্ছেদ আছে সেটা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ কর্‌তে ইচ্ছা করে না' বলিয়াই তিনি ঐ অসার যুক্তিজাল বিস্তার করিতেছেন

"বাস্তব"।

বৎসর দুই গত হইল, একখানি নূতন কাগজে রবীন্দ্রনাথের "বাস্তব" প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাহার যুক্তিহীন তর্ক পড়িয়া শুধু হাসিই আসিয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করিতে আদৌ প্রবৃত্তি হয় নাই তাই তখন 'প্রবাহিনী'র পৃষ্ঠায় সেই লেখার উপর শুধু একটু টিপ্পনী কাটিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। এখন কিন্তু দেখিতেছি, সে কাজটা ভাল করি নাই কারণ, সেই উপেক্ষার ফলেই রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অন্ধ ভক্ত সম্প্রতি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন —"বাস্তব" প্রবন্ধের পক্ষ লইয়া তাঁহারা সাহিত্যের আসরে খুবই মাতামাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

মাতামাতিটা যদি সত্যের উপর বা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা দেখিয়া সুখ আছে; কিন্তু অন্ধ-ভক্তিমাত্র সম্বল করিয়া মিথ্যার জন্য লড়াই একেবারেই সহ্য হয় না আজকালকার কাগজগুলাতে কিন্তু ঐ ধরণের লড়াইয়েরই প্রাবল্য কিছু দিন হইল, 'মানসী' কাগজে "কাব্য-কথা" নাম দিয়া যে এক লেখা বাহির হইয়াছে, তাহাতেও লড়াইয়ের ঐ ভঙ্গী দেখিলাম। তাহাতে লেখক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন

নিজের বিচার-বুদ্ধিকে জবাই করিয়া রবীন্দ্রবাবুর বাক্যকেই অভ্রান্ত বেদবাক্য মনে করিয়া তাঁহারই "বাস্তব" প্রবন্ধের জন্য রুখিয়া উঠিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন, "বাস্তব—কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। রসসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কবির মুখে এই কাব্য-কথা প্রকৃত এবং শিক্ষণীয় তথ্যে পরিপূর্ণ "

কিন্তু কেবল 'হাঁ' ও 'না' লইয়া ত তর্ক করা চলে না রবীন্দ্রনাথ অভ্রান্ত এইরূপ যাঁহাদের ধারণ, তাঁহাদের কিছু বলা বৃথা,—তাঁহাদের কিছু বুঝানো অসম্ভব তবে আমাদের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা এই যে, রবীন্দ্রনাথ এক জন পাকা বহুরূপী। সুবিধামত তিনি এক অভিমত হইতে কত অভিমতে যে গড়াইয়া বেড়াইয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই আমরা তাঁহার কতকগুলি অভিমত বাছিয়া লইয়া এই 'বাস্তব' প্রবন্ধটিকে কাটাকুটি করিব স্থির করিয়াছি তাহা হইলে, কাজ হইবে এই যে, রবীন্দ্রনাথের অবুঝ ভক্তগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া মুখ বন্ধ করিবেন। পাঠক-সাধারণের পক্ষে ইহাও একটা কম লাভ নহে!

রবীন্দ্রনাথ একটু বিদ্রূপের সুরে আজ বলিতেছেন, "আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে,

আমরা ইংরেজী পড়িয়াছি। ইংরেজী শিক্ষা বাঙ্গালীর পক্ষে বাস্তব নহে, অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেই জন্যই এখনকার সাহিত্য, 'দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না ” কিন্তু এমন কথা ত কেহ বলে না এ দেশে বোধ করি, এমন আনাড়ি কেহ নাই, যিনি বলিতে পারেন, “ইংরেজি শিক্ষা বাঙ্গালীর পক্ষে বাস্তব নহে, বা আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজী পড়িয়াছি ” তবে এ কথা আমরা বরাবর বলিয়াছি, এবং এখনও বলিয়া থাকি যে, আপনারা অনুচিকীর্ষার বশে যে সাহিত্য গড়িতেছেন, তাহা 'দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা দেয় না,—আনন্দও দেয় না, দিতে পারিবেও না ’ ঐ কথা যে কেবল আমরাই আজ নূতন বলিতেছি, তাহা নহে রবীন্দ্রনাথ যখন 'পৃথিবীর কবি' হন নাই, যখন 'বিশ্ব-সাহিত্য' গড়িবার জন্য চেষ্টা করেন নাই, তখন তিনি নিজেও ঐ কথা বলিয়াছিলেন লিখিয়াছিলেন,—“চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতির যথার্থ ভাষাটি যে কি, তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই—বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভাল জানি না।

এই নিমিত্ত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না পড়িয়া মনে হয় না, বাঙ্গালীতেই ইহা লিখিয়াছে, বাঙ্গালাতেই ইহা লেখা সম্ভব, এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে, তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয়জাত একটি নূতন জিনিষ লাভ করিতে পারিবে ভাল হউক, মন্দ হউক, আজকাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন এমন লেখা ইংরাজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে ইহার প্রধান কারণ, এখনও আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই।"

রবীন্দ্রনাথ আজ ঠিক উহার উল্টা সুর ধরিয়াছেন বটে. কিন্তু তিনিই এক দিন লিখিয়াছিলেন,—"যাঁহাদের প্রাণ বিদেশী হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন ভাব সর্ব্বত্রই সমান। জাতিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি কিছুই নাই, কথাটা শুনিতে বেশ উদার, প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের মনে একটি সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের স্বত্ব লোপ করিতে চায়। উপরে যে মতটি প্রকাশিত হইল, তাহা চৌর্য্য-বৃত্তির একটি

অশ্রাব্য ছুতা বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা ইংরেজি হইতে দুই হাতে লুট করিতে থাকেন, বাংলাটাকে এমন করিয়া তোলেন, যাহাতে তাহাকে আর ঘরের লোক বলিয়া মনে হয় না, তাঁহারাই বলেন ভাষাবিশেষের নিজস্ব কিছুই নাই, তাঁহারাই অম্লানবদনে পরের সোনা কানে দিয়া বেড়ান। আমারই যে নিজের সোনা আছে এমন নয়, কিন্তু তাই বলিয়া একটা মতের দোহাই দিয়া সোনাটাকে নিজের বলিয়া জাঁক করিয়া বেড়াই না। ভিক্ষা করিয়া থাকি, তাহাতেই মনে মনে ধিক্কার জন্মে, কিন্তু অমন করিলে যে স্পষ্ট চুরি করা হয়।”—বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এখন আর ‘মনে মনে ধিক্কার জন্মে না’। ‘বাস্তব’ প্রবন্ধে তিনি জানাইয়াছেন যে, পরের সোনাকে নিজের বলিয়া জাঁক করিলে লজ্জিত হইবার কারণ নাই।

হিন্দুর লেখায় আমরা হিন্দুত্বের অনুসন্ধান করি বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মহা চটিয়া উঠিয়াছেন। ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন,—“বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ঙ্কর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্বরচনায় এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ

করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না এইটে আমাদের বুলি সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা কালিদাসকে আমরা ভাল বলি, কেন না, তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে।"—এটা কিন্তু বিদ্রূপের কথা নয় আপনি রবীন্দ্রনাথ! আপনি যখন ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে বসিতে পাইতেন না, তখন আপনিও 'সাহিত্যের বাস্তবতা ওজন' করিতে বসিলে হিন্দুত্বটাকেই বাটখারা করিতেন আপনিও তখন 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'র সমালোচনা করিতে বসিয়া লিখিয়াছিলেন,—"কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার কাব্যের বিষয় একই উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত;—দেখাইয়াছেন, ধর্ম্ম যে সৌন্দর্য্যকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্ত সংযত কল্যাণ-রূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্য্যের আশু বিকৃতি ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্যা হয়,—যদি তাহা আপনার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হইয়া

থাকে,—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্র কন্যা অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায় একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্য দিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহ-শাবকে নর-শিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি, তাঁহার কাব্য-তপোবনে যোগীর ভাব, গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্য্যের উপকরণে গঠিত।"—এই রকম এক-আধবার নহে। বহুবার বহু রকমে রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। যখন তিনি দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র উপর একটী প্রবন্ধ লেখেন, তখন তাহাতেও ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন বাহুল্য-ভয়ে সে সব লেখা আর উদ্ধৃত করিলাম না

আসল কথাও হইতেছে তাহাই —হিন্দু কবির কাব্যে হিন্দু ভাব যদি না থাকে, তবে তাহাকে কিছুতেই খাঁটি জিনিষ বলিতে পারি না কাব্য জিনিষটা ভাষায় অঙ্কিত অন্তরের ছবি। অতএব, যে কাব্য নিছক্ অসূচিকীর্ষাবশে রচিত

(ক)

াছে, তাহাতে জাতীয় ভাব ফুটিয়া উঠা স্বাভাবিক সেখা-পীয়র, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, বা রুর, যিনি যত বড়ই সার্ব্বভৌমিক কবি বলিয়া ঘোষিত হউন না কেন, খৃষ্টানের ধর্মে ও ভাবে সকলেই ওতঃপ্রোত বাইবেল-সিদ্ধান্তের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া, দেশীয় সভ্যতা ও সাধনার আদর্শকে পরিহার করিয়া, উঁহারা কেহই নিজেদের কাব্য-গাথা রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই আর এই সকল কারণেই রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহুকাল পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছিলেন,—"ইংরাজ সমালোচকের কথা ইংরাজী হিসাবে যেরূপ সত্য, আমাদের দেশীয় সমালোচকের কথা আমাদের দেশী হিসাবে তেমনি সত্য উভয়ই বিভিন্ন অথচ উভয়ই সত্য হইতে পারে "

"বাস্তব" প্রবন্ধের এক স্থলে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে, তাহার কারণ এ নয় যে, তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখী কাঙ্গালের ঘরকন্নার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড় বড় রাজা, বড় বড় রাক্ষস, বড় বড় বীর এবং বড় বড় বানরের বড় বড় ল্যাজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোকে আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে "—রবীন্দ্রনাথ আজ রামায়ণকে "আগাগোড়া

সমস্তই অসাধারণ” বলিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ঠিক সেই মন্তব্যই আর একদিন এক বিদেশী সমালোচকের মুখ হইতে যখন বাহির হইয়াছিল, তখন কবিবর স্বয়ং লিখিয়াছিলেন,—“বিদেশী যে সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে, তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতি-প্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহাই প্রকৃত ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে পিতা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ—রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে দেশজয়, শত্রু-বিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নয়—সে যুদ্ধ-ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য

ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য কত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই" —এই সকল কথার উত্তরে কি কেহ কিছু বলিতে পারেন? বাঙ্গালার প্রিয়নাথ বাবুরা রবীন্দ্রনাথের জন্য বড়ই লড়াই করিতে উদ্যত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এবং ততোধিক লজ্জার বিষয় যে, তাঁহারা রবীন্দ্রবাবুর লেখাগুলিও মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করেন না!

রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' জিনিষটাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য "পৈতা-সংহার" কাব্য লিখিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা বিদ্রূপের কথা নহে। হিন্দুর ঘরে পৈতা-সংহার ব্যাপারটা যে কিরূপ ভীষণ 'ট্র্যাজিডি'তে পরিণত হয়, তাহা ব্রাহ্মের বংশধর রবীন্দ্রনাথ 'কবি-সম্রাট' হইলেও ত বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলে, এ ব্যাপারকে উপহাসের বিষয় মনে করিয়া কখনই ব্যঙ্গ করিতে পারিতেন না— পৈতা-সংহার করিলে হিন্দুর সংসারে যে কি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের, ঝড় উঠে, তাহা গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ জানিতেন, তাহা

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জানিতেন   কারণ পিতা-মাতার ও আত্মীয়-স্বজনের বক্ষে শেলাঘাত করিয়াই তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম হইতে হইয়াছিল—পৈতা-সংহার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এখানে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দু'য়েরই অভাব অতএব তাঁহার মুখ হইতে এ পাদ্রীজনসুলভ কথা বাহির হওয়া ত আশ্চর্য্যের কথা নহে বিস্ময়ের কথা এই যে, হিন্দুর ছেলেরাই ঐ সকল লেখা সাদরে গলাধঃকরণ করিতেছে!

আর, হিন্দুর সামাজিক কথা লইয়া কাব্য লিখিতে পারিলে যে তাহা কিরূপ অপূর্ব্ব সামগ্রী হয়, তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই—খুঁজিয়া দেখিলে অনেক মিলিবে   বেশী দূর যাইতে হইবে না,—সম্মুখেই গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' পড়িয়া রহিয়াছে। একবার অনুগ্রহ করিয়া সে নাটকখানি পড়িয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের একটা ব্যাপার লইয়া কি অপূর্ব্ব জিনিষের সৃষ্টি হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা হইতেও এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি —রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হিন্দু গৃহস্থ-ঘরের একটা সামান্য প্রাত্যহিক ব্যাপার লইয়া "যেতে নাহি দিব" শীর্ষক কবিতা লিখিয়াছেন; কিন্তু এমন চমৎকার কবিতা তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে অতি অল্পই আছে। তাঁহার যে সব

রচনা এখন বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইবে বলিয়া ঘোষিত হইতেছে, সে সব লেখা কিছু দিনের মধ্যেই কালের কঠোর স্পর্শে মানুষের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে, কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতার বিনাশ নাই ; কারণ, এ যে নিতান্তই ঘরের জিনিষ দেশের নাড়ীর সহিত ইহার যোগ আছে দেশের লোক ইহকে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না। আর বিশ্ব-সাহিত্য রচিব বলিয়া যাহা সচরাচর লিখিত হইতেছে, তাহা নিছক্ অনুচিকীর্ষা-জাত,—তাহা না এদেশের, না বিদেশের .—একেবারে আন্তরিকতাশূন্য যাহাতে আন্তরিকতার গন্ধ মাত্র নাই, সে জিনিস কিছুতেই টিঁকিতে পারে না হৃদয় হইতে যাহা বাহির হয় নাই, তাহা কেমন করিয়া হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে ? হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল মাথার সাহায্যে প্রবন্ধ লেখা যায়—কিন্তু কবিতা লেখা যায় না।

কঠোর সমালোচনা

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন এখনও আসে নাই। এই ধুয়া যাঁহারা ধরিয়াছেন, তাঁহাদের অগ্রণী হইতেছেন—স্বয় রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ এই বর্ষের বৈশাখের 'ভারতী'তে স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন,—"বাংলা সাহিত্যকে কি আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি? না পারি না এখন ইহাকে ঘের দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—ইহার কচি ডালপালাগুলোকে গোরু ছাগল দিয়া মুড়াইয়া খাইতে দিলে যে উপকার হইবে এমন কথা আমি মনে করি না এই জন্য আমার মতে বাংলা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন আসে নাই যে লেখা ভালো বলিতে পারিব না তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে। অথচ দেখিতে পাই বালক বাংলা সাহিত্য যেন অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর হাতে চারিদিক হইতে কেবলি বাণ খাইতেছে। না, সপ্তরথী বলাও ভুল—কেন না বীরের হাতের মারও নয়। ছোট ছোট সমালোচকের ছোট ছোট খোঁচা তাহাকে হয়রাণ করিয়া মারিতেছে"

প্রথমেই বলিয়া রাখি, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সমালোচনার

সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি এরূপ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্কিমের কঠোর সমালোচনার সমর্থন করিতে যাইয়া 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"নিজের বাগানের প্রতি যে মালীর যথার্থ অনুরাগ আছে, ছোট খাট কাঁটা গুল্ম জঙ্গলকে সে তীব্র কোদালি দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল ক্ষুদ্র তৃণ গুল্ম জঙ্গল অনাদরে জন্মে, তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, গুণে না হোক্ সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, ভালয় মন্দয় এমন একাকার হইয়া যায় যে নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। তখন ভাল জিনিষ আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণযোগ্য যথেষ্ট রস পায় না, ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে।"

বলা বাহুল্য, এখন তিনি ঠিক ইহার উল্টা সুর ধরিয়াছেন। কঠোর সমালোচক এখন তাঁহার চক্ষে আর কর্ত্তব্য-পরায়ণ মালী নহে; এখন তিনি তাহাকে গোরু ছাগল বলিয়া গালি দিতেছেন। আরও হাসির কথা এই যে, যিনি কঠোর সমালোচনার বিরুদ্ধে এত বকিয়াছেন, সংযম ও

শীলতার এত উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারই মুখে গালাগালির উচ্ছ্বাস!—ইহাতে শুধু হাসি আসে না,—দুঃখও হয় দুঃখ—কঠোর সমালোচনার অভাব অনুভব করিয়া যে বিচার-বিশ্লেষণের অগ্নি-পরীক্ষায় স্বাস্থ্যকর শিক্ষা এবং সংশোধিত শক্তি ও সংযম লাভ হয়, এদেশে তাহার ঠিকমত প্রচলন থাকিলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে আজ একটু সংযত হইয়াই কথা কহিতে হইত

কঠোর সমালোচনার দিন যে এখনও কেন আসে নাই, ইহার অবশ্য যুক্তি দিতে রবীন্দ্রনাথ ভুল করেন নাই। যুক্তি এই যে, 'বাংলা সাহিত্যকে আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি না'

কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে কথাটা খুব ঠিক বলিয়া বোধ হয় না এ দেশে কঠোর সমালোচনা যা' একটু দেখিতে পাই, তাহা প্রধানতঃ কবিতার উপরেই হইয়া থাকে কিন্তু এই কাব্য-সাহিত্যের বয়স নিতান্ত কাঁচা নয় প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, যে দেশে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মতন মহাকবি জন্মিয়া গিয়াছেন, সে দেশের সাহিত্যের বয়স পাকা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় আর এই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের দেশে আধুনিক ন্যাকামীপূর্ণ কবিতার প্রচলন

দেখিয়া যদি কেহ তাহার নিন্দা করে, তাহা হইলে এই নিন্দার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিসঙ্গত কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই নিন্দাকারীকে গোরু-ছাগলের সামিল মনে করিলেও তাহার নিন্দা যে সত্য, ইহা কিছুতেই তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সমালোচনা জিনিষটা এ দেশে পূর্ব্বে ছিল না। স্বভাবের নিয়মে—অনুরাগের আকর্ষণেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ছাপাখানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বাঙ্গাল পুস্তকের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থকার হইবার সখ্‌ ও গ্রন্থ ছাপিবার পয়সা, এই দুইটির সংযোগ যাঁহাতে ঘটিত, তিনিই পুস্তক প্রকাশ করিতেন। ফলে, মন্দ পুস্তকের ভাগটা খুব বেশী হইয়া পড়ে। এই মন্দ পুস্তকের কবল হইতে পাঠক-সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য, এবং ভাল পুস্তকের প্রচার-কল্পে তখন স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয় তাঁহাদের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রে পুস্তক সমালোচনার রীতি আরম্ভ করিয়া দেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় "বিবিধার্থ সংগ্রহে" লিখিয়াছিলেন, —"কি বিদ্যালয়স্থ শিশু কি অপ্রাপ্ত ব্যবহারাশ্রমস্থ অপোগণ্ড বালক সকলেই গ্রন্থকার গৌরব লাভার্থ ব্যাকুল; এমন কি,

বর্ণপরিচয়-বিহীন অংকশাস্ত্রীরাও গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইতেছে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যয় সাধন করিয়া যাহা ইচ্ছা মুদ্রিত করিতে পারিলেই গ্রন্থ নামে বিখ্যাত হইবে এবং যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, গ্রন্থ সংগ্রহকারী সহৃদয়কে অবশ্যই ক্রয় করিতে হইবে এই ভয়ানক ব্যভিচারের মূল কি? ইহা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে গেলে কেবল সমালোচন-প্রথার অসঙ্গতি এই দোষের নিদান, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে”—এই দোষ দূর করিবার জন্য তিনি ও রাজেন্দ্রলাল কড়া সমালোচনার প্রবর্ত্তন করেন এ জন্য তাঁহাদিগকে অবশ্য অনেক লেখকের বিষ-দৃষ্টিতে পড়িতে হইয়াছিল—অনেকের নিকট গালাগালিও খাইতে হইয়াছিল কিন্তু গালি খাইয়াও তাঁহারা সত্য বলিতে কখনও ভয় পান নাই। মাঝে মাঝে শুধু একটু দুঃখ করিয়া লিখিতেন,—"সত্য বলিলে বন্ধু বিগ্‌ড়ে।"

তার পর বঙ্কিমের আমলে লেখকের উপদ্রব আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি দুঃখ করিয়া লিখিলেন,—"আজি-কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্যবৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তান-সন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক যেখানে ছারপোকার

দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না ; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না।" এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' সজোরে চাবুক চালাইতে ত্রুটি করেন নাই। পরে তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শনে' কিছু দিনের জন্য সেই চাবুকের জের চালাইয়াছিলেন

তার পর 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইল যাঁহারা 'বঙ্গদর্শনে'র চাবুক খাইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন অনেকে আবার কেঁচে কলম ধরিলেন কিন্তু এ ভাব বেশী দিন স্থায়ী হইল না কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে সুরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চাবুক হস্তে সাহিত্যের অঙ্গনে দেখা দিলেন 'সাহিত্য' ও 'সাধনা'র পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলেই এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে

আজ কিন্তু সহসা রবীন্দ্রনাথের প্রাণ বাঙ্গালী লেখকদের জন্য কাঁদিয়া উঠিল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনিই অথচ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,— "অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের এ দেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ লেখার সহিত কোন্ যথার্থ দায়িত্ব

না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলে খেলা করিয়া গেলেও তাহা "প্রথম শ্রেণীর" ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয় বন্ধুরা বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমত নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।"

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, দুঃখের সেই কারণ এখন ক্রমশঃ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথ এখন উপদেশ দিতেছেন,—"যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না, তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে" কেন? পাঠক বেচারী—যাহারা ঘরের পয়সা খরচ করিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়ে, তাহাদের সহিত প্রতারণা করাই কি সমালোচকের ধর্ম্ম? সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন কি তবে একাকার হইয়া যাইবে?

কঠোর সমালোচনার আঘাত রবীন্দ্রনাথ খুব অল্পই সহ্য করিয়াছেন সত্য কিন্তু সেই স্বল্প আঘাতের ফলে যে তাঁহার একটু উপকার হইয়াছিল, সে কথা তিনি আজ কেন বিস্মৃত হইতেছেন? কেন ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বাহুর

করলে না পড়িলে তাঁহার 'কড়ি ও কোমলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ অতটা আবর্জ্জনা বর্জ্জিত হইত না ?

তাই বলিতেছি যে, তাঁহার আগেকার অভিমতই সত্য ২৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, "এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং অ ঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না ”

"সদুপায়"

মনীষার অধিকারী হইয়া সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে নানাপ্রকার অভিনয় করা চলিতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিয়া দেশবাসীর হৃদয় জয় করা কেবল মনীষায় হয় না। অপরের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে হইলে নিজের হৃদয় ও মুখ এক করা চাই,—ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে চলিবে না। শিবাজী, ম্যাট্সিনী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এই কথারই উজ্জ্বল উদাহরণ। অসাধারণ মনীষা এবং প্রগাঢ় প্রেম যাঁহাতে একত্র মিলিত হইয়াছে, কেবল তিনিই রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিবার অধিকারী। আর যিনি আত্ম-নিগ্রহের বিন্দুমাত্র উত্তাপ সহ্য করিতে ভীত, যিনি আপনাকে বাঁচাইয়া ত্যাগের দৃষ্টান্তের জন্য অপরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন,—তিনি যত বড়ই মনীষী হউন, যত বড়ই কবি হউন, তাঁহার এ পথে 'প্রবেশ-নিষেধ'। কারণ, যেখানে আন্তরিকতার অভাব, সেখানে লঘুতাই প্রবেশ করিয়া থাকে। আর যেখানে সেই লঘুতা আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানে মতের কখনও স্থিরতা দেখা যায় না—মত কেবলই পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব এরূপ মনীষীর মতানু-

সারে কার্য্য করিতে গেলে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই অধিক

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই ধরণের মনীষী রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার মতের কোনও ঠিক নাই যে সকল উপকরণ করতালির অনুকূল, তাঁহার রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে অবশ্য সে সকল উপকরণ যথেষ্ট আছে তাহাতে ভাষার ঝঙ্কার আছে, ভাবের ঘনঘটা আছে, রাশি রাশি উপমাও আছে এক একটি প্রবন্ধকে শব্দ-রঞ্জিত চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু রাজনৈতিক রচনার যাহা প্রাণ যুক্তি, আন্তরিকতা ও প্রাঞ্জলতা—প্রবন্ধগুলিতে তাহারই একান্ত অভাব

উপমা জিনিষটা কামধেনু,—তাহার প্রয়োগ দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী মতকে সমর্থন করা কঠিন ব্যাপার নহে রবীন্দ্রনাথ এই উপমা জিনিসটায় মন্ত্রসিদ্ধ তিনি যখন যে মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, তখন সেই মতকে সমর্থন করিবার জন্য যুক্তির পরিবর্ত্তে রাশি রাশি উপমা সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিয়া দেন, এবং পাঠক-সাধারণও তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য আছে কি না, তাঁহার মতামতের ধারা ঠিক আছে কি না, অত ভাবিবার

অবকাশ পায় না। তাহারা তাঁহার যে লেখা যখন পড়ে, তখন সেই লেখাকেই অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে

যাহা হউক, রাজনীতিক বিষয়ে আমরা নিজেদের কোনও মতামত দিয়া অনধিকার চর্চা করিব না এ প্রবন্ধে শুধু এইটুকুই দেখাইয়া দিব যে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রবাবু কি রকম ডিগ্‌বাজী খাইয়াছেন

মনে পড়ে, আজ সে প্রায় পনের ষোল বৎসরের কথা—লর্ড ক্রসের বিলের আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছিলেন,—"স্বার্থই যদি ইংরাজ ভারত-শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগের এমন দুর্দ্দশা হইত যে, ক্রন্দন করিবার অবকাশ থাকিত না " এই প্রবন্ধ-পাঠের কিছু কাল পরে, জানি না কেন, রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ব মত বিস্মৃত হইয়া ইংরাজের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া 'অত্যুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিলেন,—"আজকালকার সাম্রাজ্য-মদমত্ততার দিনে, ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত ; আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে তাই ঠিক যে সময়ে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায়,......ঠিক সেই সময়টাতেই অধম ভারতবর্ষের

রাজভক্তি ইংরেজ নানাপ্রকারে বিশ্বজগতের কাছে উদ্‌ঘোষিত করিবার আয়োজন করিতেছে, —আশানুরূপ ফলও পাইয়াছে, শূন্য ঘট যথেষ্ট পরিমাণে শব্দ করিতেছে ”

শুধু ঐ 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধ পড়িয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। ইংরাজের প্রতি তাঁহার এই 'কাড সুর' উত্তরোত্তর চড়িয়াছিল উহার পর হইতে—"স্বার্থই যে ইংরাজের ভারত-শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য" এই কথা তাঁহার বহু রাজনীতিক প্রবন্ধেই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল তাঁহার "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধে ঐ কথাই স্পষ্ট করিয়া বলা হয় যে, "একটা জাতিকে, যে কোন দিকেই হোক, একেবারে অক্ষম ও পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সঙ্কোচ অনুভব করে নাই ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে।...

...ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ নহে, একটি মহাদেশ বিশেষ এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম্ম, যাহারা এককালে মৃত্যুভয়হীন বীর জাতি ছিল, তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্র পশুর নিকট শঙ্কিত নিরুপায় করিয়া রাখ যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে চিন্তা

ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না।......অ্যাংলোস্তানান্‌ যে শক্তিকে সবলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপহরণ করিয়া এ দেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে—অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীরুতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দণ্ডবদ্ধ ভীরুতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।" এইরূপে কবিবরের এই 'কড়ি সুর' ক্রমশঃই চড়িতে চড়িতে সপ্তমে গিয়া পৌঁছিয়াছিল 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী'তে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেও ঐ সুর সম্পূর্ণ বজায় আছে। কিন্তু ঐ কড়ি সুরের ঐখানেই শেষ খেলা। তাহার পর সহসা এক দিন উহা 'কোমলে' নামিয়া আসিল। সেই 'কোমল সুর' তাঁহার "ব্যাধি ও প্রতীকার" নামক প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রথম ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহার নিকট হইতে "পথ ও পাথেয়," "সমস্যা" এবং "সদুপায়" নামক তিনটি পর পর এক সুরে বাঁধা প্রবন্ধ পাইলাম। এই তিনটি প্রবন্ধই পরস্পর পরস্পরের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই প্রবন্ধ-ত্রয়ের উক্তির সহিত তাঁহার পূর্ব্বরচিত প্রবন্ধাবলীর উক্তির কোনই সামঞ্জস্য নাই। এক্ষণে তাঁহার শেষোক্ত 'সদুপায়'

নামক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া সে কথা প্রমাণ করিয়া দিতেছি

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন,—"আমরা ধৈর্য্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুবিধা অসুবিধা বিচার মাত্র না করিয়া বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর কোনো ভালমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। .....আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের (দেশের সাধারণ লোকের) কাছে যাই নাই যে, "দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে, এই জন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না"। আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, "ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না, অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।"

"কখনো যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না। .....

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসা বশতঃই যে গিয় ছিলাম তাহা নহে।"

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথই ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে পাবনা সম্মিলনীতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—"যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে। আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদান-প্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে এবং কংগ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই। .."

"এমন সময় লর্ড কর্জ্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন, যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোন আচ্ছাদন রহিল না।"..."বাংলাকে যেমন দুই

থানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালী, আমরা যে এক! বাঙালী কখন্ যে বাঙালীর এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন্ বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে তাহা ত পূর্ব্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই ”

“আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া পড়িল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোন গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারো চলৎ শক্তি আছে আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না।”

"আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সমস্ত সত্য আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা সঙ্কীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ এ যে শক্তি এ যে সম্পদ! ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে, ইহা নিজেকে শক্ত করিবার"

"শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশীবর্জ্জন ব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনই সহিতে পারিতাম না কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই বিশেষতঃ প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের ক্রোধ কখনই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না"

রবীন্দ্রবাবুর এই উক্তি এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি উভয়ই সম্পূর্ণ বিপরীত। একের প্রত্যেক ছত্র অপরের প্রত্যেক ছত্রের প্রতিবাদ করিতেছে তিনি একবার বলিতেছেন যে, 'বিদেশীবর্জ্জনব্যাপার অন্যকে জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার এ যে শক্তি! এ যে সম্পদ" আবার অন্যত্র বলিতেছেন, "ইংরাজকে জব্দ

কবির বলিয়াই দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই"—এইরূপই আগাগোড়া!

যে রবীন্দ্রনাথ এক দিন বলিয়াছিলেন,—"বাহির হইতে এই হিন্দু মুসলমানের ভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব" "এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা জোগাইবার সাধ্য গবর্ণমেণ্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনো দিন কোনো দিক্ হইতে তাহা রাজবাড়ীরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে যদি এ কথা সত্য হয় যে, হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্য মুসলমানদিগকে অসঙ্গতরূপে প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্ততঃ ভাব-গতিক দেখিয় মুসলমানদের মনে যদি সেই রূপ ধারণা

দৃঢ় হইতে থাকে তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না।"—সেই রবীন্দ্রনাথই পরে স্বীয় উক্তি পদদলিত করিয়া 'সদুপায়' নামক প্রবন্ধে বলিতেছেন,—"মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই ; দুই পক্ষে এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম। কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের আর এক স্থানে বলিতেছেন,—" জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না?......এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না?" কিন্তু এ কথার উদ্ভবও তাঁহারই লেখায়

আছে অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহতভাবে চলে না যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ প্রেমের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্ম্মের স্রোতেরও সেই দশা দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্ম্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে জীবন-ধর্ম্মের অতি চাঞ্চল্যে পরস্পরকে একবার আঘাত করিয়াছে, সেই জীবন-ধর্ম্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া পরস্পরের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে" শুধু ইহাই নহে 'আমাদের দেশের যে সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সঙ্কট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিয়াছেন' কবিবর স্বয়ং তাঁহাদিগের কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন "তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ ; ইহার প্রবল পুণ্য স্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্ব্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে"

'সদুপায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়াছেন, "বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার

একমাত্র উপায় অতএব ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সঙ্কীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা।" অথচ ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথই বঙ্গালীকে বুঝাইয়াছিলেন যে, 'বিধাতার ইচ্ছা' অর্থে 'রাজশক্তির সহিত বিরোধ।' 'ব্রতধারণ নামক প্রবন্ধে তিনিই লিখিয়াছিলেন যে—"বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে অাজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিবেন না; আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবল রূপে, যথার্থ রূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না ......আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যত দিন পর্য্যন্ত আমরা নিজ শক্তিকে অঙ্গীকার না করিব, তত দিন পর্য্যন্ত ক্ষীর শক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজনীতিতে আমি অনভিজ্ঞ।—নিজে কিছু বলিব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, দেশের

লোকেরা করিবেন কোন্ রাজনীতিক মার্গ অবলম্বন করিবে ?

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক প্রবন্ধগুলিতে এইরূপ পরস্পর-বিরোধী উক্তি আরও রাশি রাশি আছে তাহা উদ্ধৃত করিলে একখানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে কিন্তু রচনাকে আর ভারাক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করি না যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি, আশা করি, তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

'অভিভাষণ'

১৩২০ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ রবিবারে, রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে যে 'অভিভাষণ' পাঠ করেন, তাহা শুনিয়া ও পাঠ করিয়া আমাদের দেশে তাঁহার ভক্ত, অভক্ত ও অতি-ভক্ত, এই তিন সম্প্রদায়ই, অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই অল্প-বিস্তর ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিলেন অনেকেই দুঃখ করিয়া তখন বলিযাছিলেন,—রবীন্দ্রনাথকে 'বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা'র নামে "শ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দনে অভিনন্দিত" করায়, তিনি যে এতটা অবজ্ঞার ভাষায় এমন 'অপ্রসন্নবাণী' প্রকাশ করিবেন, তাহা কেহ স্বপ্নেও মনে করে নাই — মনে করে নাই যে, জগতের সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে এমন অভ্রভেদী অহমিকার অভিনয় কখনও কাহারও দ্বারা আভনীত হইবে ব হইতে পারে

যিনি যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি যে, ঐ 'অভিভাষণ'-পাঠে আমরা সত্যসত্যই খুব খুসী হইয়াছিলাম। খুসী হইবারই কথা!—সম্বর্দ্ধনাকারীদের মুখ চাহিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আপন বিশেষত্ব ক্ষুণ্ণ করেন নাই, ইহা দেখিলে কাহার মনে আনন্দ না হয়? তিনি যদি ঐ সম্মানের উপহার প্রত্যাখ্যান না করিয়া সাদরে গ্রহণ

করিতেন, তাহা হইলে, তখন হয়ত অনেকেই সুখী হইতেন কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্বের সবিশেষ অপচয় ঘটিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু শ্রেয়ঃ কোন্ জিনিষটা,—সাধারণের সন্তোষ-বিধান, না, নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখা ? শ্রেয় যাহা, রবীন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন কাহারও মুখ না চাহিয়া নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছেন সে বিশেষত্বটা বুঝাইয়া বলিবার জন্যই এ রচনার অবতারণ আশা আছে, রবীন্দ্রীয় বিশেষত্ব বুঝাইতে পারিলে, তাঁহার ভক্তদের 'ভগ্ন-হৃদয়' আবার জোড়া লাগিবে,—অনেকেরই মুখে আবার প্রসন্নতার হাসি ফুটিয়া উঠিবে

"কবিবরের অসামান্য প্রতিভার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার মত 'নিতুই-নব' কবিবরের নিকট আজ যাহা 'হাঁ', কাল তাহা 'না' " রাজনীতি, কাব্যনীতি ও সমাজ-নীতি প্রভৃতিতে তাঁহার মত নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে তাহা দেখাইয়াছি এবারে দেখাইব যে, কবিবরের অভিভাষণ-নীতিও উক্ত বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত নহে। দেখাইয়া দিব যে, বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'টাউন হলে' দাঁড়াইয়া আপন অভিভাষণে যে মত ব্যক্ত

করিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক তাহার বিপরীত অভিমত এই নূতন অভিভাষণে প্রকাশ করিয়াছেন

এই অভিভাষণে কবিবর তাঁহার সম্বর্দ্ধনাকারীদের সম্বর্দ্ধনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন, "আজ আমাকে সমস্ত দেশের নামে আপনারা যে সম্মান দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তা অসঙ্কোচে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই" "যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্ম্মবীর, সর্ব্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য। কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয় মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রেই কবির কাজ এবং সেই হৃদয়ের প্রীতিতেই তাঁর কবিত্বের সার্থকতা . কিন্তু এই হৃদয়ের নিয়ম বিচিত্র সেখানে কোথাও মেঘ কোথাও রৌদ্র। অতএব প্রীতির ফসলেই যখন কবির দাবী, তখন এ কথা তাঁর বলা চলবে না যে, নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণেরই প্রীতি তিনি লাভ করবেন"

কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ইহার প্রায় দুই বৎসরকাল পূর্ব্বে, টাউনহলে যখন তাঁহার "ললাটকে সম্মান-ধারায় অভিষিক্ত" করা হয়, তখন সেইখানে বলিয়াছিলেন,—"আজ আপনাদের নিকট হইতে যে সমাদর লাভ করিলাম, তাহাকে এখন দুর্ল্লভ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি ইহা স্তুতিবাক্যের

মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই উপহার।” “আপনারা আমার এ বয়সেও তরুণের প্রাপ্যই আমাকে দান করিয়াছেন। তাহাই কবির প্রাপ্য। তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি।”

“বুদ্ধির জোরে নয়, বিদ্যার জোরে নয়, সাধুত্বের গৌরবে নয়, যদি অনেক কাল বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো একটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি, তবে আমি ধন্য হইয়াছি—তবে আমার আর সঙ্কোচের কোনো কথা নাই।”

“আজ চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি—ভুল-চুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারম্বার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই সমস্ত কঠোরতা বিরুদ্ধতার ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মাল্যদান করিলেন, তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।”

এক ‘অভিভাষণে’ কবিবর ভক্ত-প্রদত্ত মাল্য-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া বলিতেছেন,—“আমার আর সঙ্কোচের কোনো কথা নাই” এবং অন্য অভিভাষণে সেই ‘প্রীতির মাল্য’

প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন,—"অসঙ্কোচে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নাই " একবার বলিতেছেন যে, "তাহাই কবির প্রাপ্য তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি " অন্যত্র ঠিক তাহার বিপরীত বলিতেছেন, "কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয় ' এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ অভিমতে 'অভিভাষণ' দুইটি পরিপূর্ণ ইহা ছাড়া, স্থানে স্থানে হেঁয়ালীও যে একটু আধটু নাই, এমন নহে।

এই নূতন 'অভিভাষণে'র আর একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—"আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন, তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্য্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিব না। এর মত্ততা থেকে আমার চিত্তকে আমি দূরে রাখতে চাই।"

কিন্তু ইহার প্রায় দুই বৎসরকাল পূর্ব্বে, কবিবরের সম্বর্দ্ধনার সময়, কবিবর স্বয়ং বলিয়াছিলেন,—"আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে একথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশী-

ঋাদের মত মাথায় করিয়া লইলাম—ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে; আমার অহঙ্কারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না" এখানেও ছত্রে ছত্রে বিরুদ্ধ উক্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নূতন 'অভিভাষণে' বলিতেছেন,—"যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্ম্মবীর, সর্ব্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়"—এ কথাটার কোনও মূল্য আছে বলিয়া বোধ করি না জগতে যত দিন রুচিভেদ থাকিবে, ততদিন অপ্রীতি জিনিষটা হইতে একেবারে মুক্তি লাভ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই 'বিরোধের মধ্যেই যখন আমাদের বাস' তখন এ কথা বলা চলে না যে, কোনও ব্যক্তিবিশেষের অদৃষ্টে 'সর্ব্বসাধারণের প্রীতিলাভ' ঘটিতে পারে। বাস্তব জগতের কথা দূরে থাক্, এমন কি, কল্পনা-জগতেও এমন অঘটন ঘটিতে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেখানেও দেখিতে পাই, কবিগুরু বাল্মীকি যাঁহাকে আদর্শ করিয়া গড়িয়াছেন, সেই রামচন্দ্রের মত রাজাও 'সর্ব্বসাধারণের প্রীতিলাভ' করিতে সমর্থ হন নাই। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতন মহাপুরুষও

সর্ব্বসাধারণের মন রাখিয়া চলিতে পারেন নাই কর্ম্মবীর হউন, আর কবিই হউন, সকলের কর্ম্মই জনসাধারণের হৃদয়ের সঙ্গে শতসূত্রে আবদ্ধ অতএব, হৃদয়ের যাহা নিয়ম —কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র—তাহা কবির কাব্যের বেলায় যেমন সত্য, 'কর্ম্মবীরে'র কর্ম্মের বেলাতেও তেমনি সত্য হৃদয়ের ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই একরূপ প্রীতির কারবার কাহারও একচেটিয়া হইতেই পারে না।—এইটেই সত্য, এইটেই স্বাভাবিক।

সমাজ-সংস্কার

বিধি-নিষেধের কঠোর আবরণের অন্তরালে জাতির ও বংশের ধারা কোনো করিয়া আমরা আত্মরক্ষা করিতেছি আত্মরক্ষার জন্যই আমাদিগকে এই কচ্ছপ-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

এ কথা যে আজ আমরা নূতন বলিতেছি, তাহা নহে। স্বজাতির প্রতি যাঁহার মমত্ব-বোধ আছে, স্বজাতির আচার-পদ্ধতির প্রতি যাঁহার শ্লাঘাবোধ আছে, তিনিই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ মনীষী ভূদেবের মুখ হইতেও ঐ কথা বহুবার বাহির হইয়াছে।

কিন্তু কিছু দিন হইতে রবীন্দ্রনাথ ঐ মতের বিরুদ্ধে খুব জোরের সহিত কলম চালাইতেছেন আমাদিগকে কূর্ম্ম-বৃত্তি ত্যাগ করিতে যে শুধু উপদেশ দিতেছেন, তাহা নহে। তাঁহার 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' ও 'সবুজের অভিযান' প্রভৃতি গদ্য ও পদ্য নানা রচনায় তিনি এখন হিন্দুর সমস্ত সামাজিক আচার-পদ্ধতিকে তীব্র উপহাস করিতেছেন,—অত্যন্ত ধিক্কার দিতেছেন। এজন্য অবশ্য তাঁহার ততটা নিন্দা করি না। —হিন্দু-সমাজকে ভাঙ্গিতে না পারিলে যখন ব্রাহ্ম-সমাজের

পুষ্টি অসম্ভব, তখন নবীন ব্রাহ্ম-আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে হিন্দু-সমাজের প্রতি এমন বিদ্বেষপরায়ণ হওয়া কতকটা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করি যদিও রবীন্দ্রনাথের রচনা-সাগর মন্থন করিলে দেখা যায় যে তাহার একস্থানে আছে,—"যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে"—কিন্তু কথাটা বোধ করি কবি কেবল পরকে উপদেশ দিবার জন্যই লিখিয়াছিলেন,—নিজে করিবেন এ হিসাবে বলেন নাই।

যাহা হউক, প্রথমেই বলিয়া রাখি, একথা কেহ স্বপ্নেও মনে করিবেন না যে, রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দয় গোলন্দাজীতে ভয় পাইয়াই আমরা তাঁহার আধুনিক সামাজিক প্রবন্ধের আলোচনা করিতে বসিয়াছি। কারণ, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজের যে কেহই নহেন—সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের মূল্য যে একজন মিশনারীর মতের মূল্য অপেক্ষা এক কাণা কড়িও বেশী নহে, একথা আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বেশ ভাল করিয়া জানে ও বুঝে।

তবে তাঁহার এ মতামত লইয়া আলোচনা কেন?—আলোচনা এই জন্য যে রাজনীতি, সাহিত্য-নীতিতে তিনি যেমন দুই চারিটা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার

সমাজ-নীতিতেও তেমনই পরস্পর-বিরোধী মত অনেক আছে। এই বিশেষত্বটুকু দেখাইবার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

'বিবেচনা ও অবিবেচনা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রবাবু হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষের সুরে বলিতেছেন,—"আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় খাঁচাটাকে ভাঙ্গ, কারণ—ওটা আমাদের ঈশ্বর দত্ত পাখা দুটাকে অসাড় করিয়া দিল ; নয় বলিতে হয় ঈশ্বর দত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা ত আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্ট পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্ট খাঁচা সনাতন ; অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম্ম, আর তাহার অনন্ত আকাশ-ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।"

"আমাদের সামাজিক কামারে যে শলাটী যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া

পড়িয়া অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেন না অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সব চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।”

“মানা, মানা, মানা; শুইতে বসিতে কেবলি মানা মানিয়া চলিতে হইবে ………………আমাদের সমাজ, সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুল বাজির কারখানা খুলিয়াছে তারে তারে আপাদ-মস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কি আশ্চর্য্য তাহার কৌশল ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে ”

হিন্দুসমাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের এ আক্ষেপ, এ মায়াকান্না দেখিয়া সত্যই আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেছি না। কারণ, এখন তিনি যে সমাজকে ‘পুতুলবাজির কারখানা’, সনাতন ঘানি’ ও ‘সনাতন খাঁচা’ প্রভৃতি বলিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছেন, সেই সমাজ সম্বন্ধে তিনিই আর একদিন, —যখন ব্রহ্মবান্ধবের প্রভাব আসিয়া তাঁহার উপর আধি-

পত্য বিস্তার করিয়াছিল—তখন লিখিয়াছিলেন,—"একথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ—সকলের বড় অন্যদেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকার সঙ্কটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যায় নাই, এখনো যে আমাদের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আচারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহু দুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ী পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরী নিজে আধমরা হইয়া ছোট্ট ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড় বলিয়া জানায় নাই। সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্ম্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের

সর্ব্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।"—এই মতের সঙ্গে পূর্ব্বোদ্ধৃত মতটুকু মিলাইয়া পড়িলে হাসি আসে না ?

'আমাদের সামাজিক কাঁদরে' যে 'শলাগুলো' পড়িয়া গিয়াছেন, সেই 'শলাগুলোর' উপর রবীন্দ্রনাথের এখন ভয়ঙ্কর আক্রোশ কারণ, এই শলাগুলো অর্থাৎ জাতিভেদ, প্রতিমাপূজা, অবরোধ-প্রথা, বালিকা-বিবাহ, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি হিন্দু সমাজ-পদ্ধতিগুলা ব্রাহ্ম-সমাজে নাই ও গুলা আমাদের না থাকিলে আমরা অনায়াসে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিতাম—এক হইতাম কিন্তু ঐ এক হইবার পক্ষে যত কিছু বাধা ঐখানে। তাই রবীন্দ্রবাবুর অত রাগ। কিন্তু উহা কি আমরা ছাড়িতে পারি ? ঐ সামাজিক ব্যবহার-পদ্ধতিগুলাই আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা উহা আছে বলিয়াই আমরা আজও বাঁচিয়া আছি। উহা আছে বলিয়াই আমাদের জাতিকুল সব মুছিয়া যায় নাই, দেশের অতীতের সহিত সকল সম্বন্ধ নষ্ট হয় নাই এ কথা রবীন্দ্রনাথও যে না জানিতেন বা স্বীকার না করিতেন, এমন বলি না। ভক্তেরা তাঁহাকে 'ঋষি' বা 'আচার্য্য' বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তিনি নিজেই একবার হিন্দুর সমাজ-

সংস্থানের সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্য দিকে ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজ-সংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে, সে ইহাকে বর্ব্বরতা বলিয়া উড়াইয় দিতে পারে না। ভারত-বর্ষ রক্ষা করিতে গিয়া ইংরাজকে যেমন ব্যয়বাহুল্য সত্বেও জিব্রাল্টার, মাণ্টা, সুয়েজ এবং এডেন রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ পরিবারের দৃঢ়তর ও অখণ্ডত রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুকে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই সকল নিয়ম পালন করিতে হয়।"

প্রাচীন সংহিতাকারকে 'কামার' বলিয়া রবীন্দ্রনাথ আজ সুরুচির ও সুবিবেচনার পরিচয় দিতেছেন ভাল; কিন্তু ইনিই কিছুকাল পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন,—"প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র কোনো একটী বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা, সংযমের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার আশ্রমে মঙ্গলকর্ম্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; তৃতীয় বয়সে উদারতর-ক্ষেত্রে একে একে সকল বন্ধন শিথিল

করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তর রূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্ত সঙ্গত-পূর্ণ-তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। একথা যদি অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারি, তবে বলিতেই হইবে, এই সত্যকেই উপলব্ধি করিবার জন্য সকল জাতিকেই, নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারংবার চেষ্টা করিতেই হইবে" রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজকে আজ 'কামারের সৃষ্টি সনাতন খাঁচা' বলিয়া তাহার উপরে খোঁচা মারিতেছেন বটে, কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত তাঁহার রচিত লাইন কয়টিতে সেই 'কামারের' আর 'সনাতন খাঁচার'ই জয় ঘোষণা হইয়াছে।

এক প্রবন্ধে তিনি 'হিন্দুসমাজ আমাদের পুতুল বানাইল' বলিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন, আবার অন্য প্রবন্ধে হিন্দু সভ্যতার দোহাই দিয়া এই সমাজেরই জয় জয়কার করিয়া বলিতেছেন,—'হিন্দু সভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই ,প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশীয়, দ্রাবিড়ী তৈলাঙ্গী, নায়ার,—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ ধর্ম্ম,

ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের একটী বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দু সভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানা প্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই—উচ্চ, নীচ, সবর্ণ, অসবর্ণ সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্ম্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্ত্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।”

রবীন্দ্রনাথ আজ আবেগভরে বলিতেছেন,—

“শিকল দেবীর ঐ যে পূজা বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি!
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা বাছা!
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা!”

তারপর, গদ্যে বলিতেছেন,—“জোর করিয়া চোখ বুজিয়া যদি না থাকি তবে নিজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারা দেখিতে পাইব। এখানে স্থলের স্থাবরতা ভয়ঙ্কর হইয়া বসিয়াছে; এ যে পক্ক কেশের শুভ্র মরুভূমি ”

“ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে সমস্ত ‘মমি’

মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন ?"

কেন ! আপনি রবীন্দ্রনাথ ,—আপনিও ত একদিন—বেশী দিনের কথা নহে, দশ বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের এই চেহারা দেখিয়াই উচ্ছ্বাসভরে লিখিয়াছিলেন,—"সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয় তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মকে বড় করিয়া তুলে নাই ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র ধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটা-মণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষ কৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারত-বর্ষ কর্ম্মের ক্রীতদাস নহে "

শুধু ইহাই নহে। যে রবীন্দ্রনাথ আজ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গিয়াছে," সেই রবীন্দ্রনাথই অন্য এক দিন দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—"নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারত-বর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে ; আমরা নিজেই ইহাকে জানি না। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে

স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য্য, তাহা আমরা কয়েক জন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে, এখনো ভারতবর্ষ হতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই।" রবীন্দ্রনাথের কোন্ কথাটা সত্য, তাহাই একবার তাঁহার মুখে এখন শুনিতে ইচ্ছা করে।

বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন স্তব্ধতা আজ ক্ষুব্ধ হইতেছে ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ আনন্দে গদগদ হইয়া বলিতেছেন,—"পারিয়া উঠিবেন না। যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেক দিন একাধিপত্য করিয়াছেন। কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক"

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথই আর একদিন বলিয়াছেন,—"বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, একথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তিক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত,

আমাদের চরিত্র ভগ্ন বিকীর্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কার্য্য-প্রণালী অতি সহজ সরল, অতি প্রশান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ়। তাহাতে আড়ম্বর মাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না। সতী স্ত্রী অনায়াসেই স্বামীর চিতায় আরোহণ করিত, সৈনিক সিপাহী অকাতরেই চানা চিবাইয়া লড়াই করিতে যাইত, আচার রক্ষার জন্য সকল অসুবিধা বহন করা, সমাজ রক্ষার জন্য চূড়ান্ত দুঃখ ভোগ করা এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা, তখন অত্যন্ত সহজ ছিল। নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে; আমরা নিজেই ইহাকে জানি না। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম্মরক্ষায় দৃঢ়ত্ব দান করিয়াছে। শক্তির মর্ম্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং সময়কালে

এই দীন হীন বেশভূষা-হীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদৃঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপর আপন বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিবে,—ইংরাজি কোর্ত্তা, ইংরাজের দোকানের আসবাব, ইংরাজী মাষ্টারের বাক্‌ভঙ্গিমার অবিকল নকল কোথাও থাকিবে না, কোন কাজেই লাগিবে না, আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না,—জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাস মাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি; তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্র-রৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী—তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বাহ্য আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর,

যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিমসমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেন-রাশি—তাহা, যদি কখনও ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে তখন এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ—তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন, তাহাকে অবিশ্বাস করিব না,—যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না ; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।"

অচলায়তনের বেড়া ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ আজ পাগলামীর স্মরণ লইয়া বলিতেছেন বটে যে, "পাগ্‌লামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি," কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি নিজের মুখেই আমাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন, সন্তোষই আমাদের জাতীয় সভ্যতার ভিত্তি। আজ সেই ভিত্তিকে নির্ম্মূল করিবার জন্য তিনি 'অশান্ত' 'প্রমত্ত' ও 'ভুল গুলোকে' ডাক দিতেছেন, অথচ তিনিই একবার বলিয়াছিলেন,—"য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি যে লোক জাহাজে আছে, তাহার

পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে, তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে, সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্দ্ধা বাক্য শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধন বস্তুকে ভাঙা কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সঙ্গত হয় না।”

“ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। ইহাতে প্রতিযোগিতা-চকমকির ঠোকাঠুকি শব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধ নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও স্ফুলিঙ্গকে এই ধ্রুব জ্যোতির চেয়ে মূল্যবান্ মনে করা বর্ব্বরতা মাত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিদ্যালয় হইতেও যদি সে বর্ব্বরতা প্রসূত হয়, তবু তাহা বর্ব্বরতা মাত্র।”

রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের উপদেশ দিতেছেন,—“তোমার এই বনেদী স্থাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিষ নহে, যেমন করিয়া পার একটা কর্ম্মে লাগিয়া যাও।” কিন্তু এস্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদ-বর্গ তখনি হাঁ হাঁ করিয়া আসিবে। কিন্তু আপনি রবীন্দ্র-নাথ, আজ যাহাকে ‘বনেদী স্থাবরত্ব’ বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য

করিতেছেন, আপনি নিজেও একদিন মুগ্ধচিত্তে সেই 'স্থাবরত্বে'র গৌরব গান করিয়াছিলেন আপনিও একদিন গতির চেয়ে স্থিতিকে, করার চেয়ে হওয়াকেই উচ্চাসন দিয়াছিলেন। মনে পড়ে কি আপনারই লেখা—'অধুনা আমাদের কাছে কর্ম্মের গৌরব অত্যন্ত বেশী হাতের কাছে হোক্—দূরে হোক্—দিনে হোক্—দিনের অবসানে হোক্—কর্ম্ম করিতে হইবে। য়ুরোপের লাগাম পরা-অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপায়েই হোক, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে। এই কর্ম্ম-নাগর-দোলের ঘূর্ণিনেশা যখন একটা জাতিকে পাইয়া বসে, তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না। কিন্তু এখানে আশ্রমে নির্জ্জন প্রকৃতির মধ্যে শুদ্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্ম্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্ম্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনই চাই, দেখি, সে অক্লিষ্ট অক্লান্ত, যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ

করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিম্নে গোপন করিয়া, স্থিতিকেই গতির ঊর্দ্ধে রাখিয়া প্রকৃতি আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশমান রাখিয়াছে—ঊর্দ্ধশ্বাস কর্ম্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়মান কর্ম্মের স্তূপে নিজেকে আচ্ছন্ন করে নাই। ......ভারতবর্ষ এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্য মাত্র"

এইরূপ কথা কাটাকাটি আরও অজস্র আছে। তিনি কখনও হিন্দুসমাজের স্তব করিয়াছেন, কখনও বা তাহার উপর গালাগালির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন। সুবিধাবাদী যেমন মিনিটে মিনিটে মতান্তরে গড়াইয়া চলে, রবীন্দ্রনাথও তেমনই গড়াইয়াছেন!

রবীন্দ্রনাথের কালির আঁচড়ে হিন্দুসমাজের কেশাগ্রও যে কাঁপিবে না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথও আমাদিগকে একদিন শুনাইয়াছেন, "বহু শত বৎসরের অনবরত বিপ্লব যে সমাজকে ভূমিসাৎ করিতে পারে নাই; সহস্র দুর্গতি সহ্য করিয়াও যে সমাজ ভারতবর্ষকে দয়া ধর্ম্ম ক্রিয়া কর্ত্তব্যের মধ্যে সংযত করিয়া তুলিয়া

রাখিয়াছে, রসাতলের মধ্যে নামিতে দেয় নাই ; যে সমাজ হিন্দু সমাজের বুদ্ধি-বৃত্তিকে সতর্কতার সহিত এমনভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে যে, বাহির হইতে উপকরণ পাইলেই তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে ; যে সমাজ মূঢ় অশিক্ষিত জনমণ্ডলীকেও পদে পদে প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিবার ও সমাজের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য করিয়াছে ; সেই সমাজকে যিনি শ্রদ্ধার সহিত না দেখেন, তিনিও শ্রদ্ধার যোগ্য নহেন"— রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আজ রবীন্দ্রনাথেরই প্রতি প্রয়োগ করিয়া এ প্রবন্ধ এইখানেই শেষ করিলাম

কঠোর সমালোচনা

(পরিশিষ্ট)

রবীন্দ্রনাথের "এখন ও তখন" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আরও গুটি কয়েক কথা বলা দরকার কারণ, এই পুস্তক যখন ছাপা হইতেছে, তখন দেখিলাম, 'ভারতী' কাগজে রবীন্দ্র-বাবুর উক্ত প্রবন্ধের উপর "ভালো-মন্দ" নাম দিয়া এক প্রকাণ্ড সার্টিফিকেট বাহির হইয়াছে; এবং সেই সার্টি-ফিকেটের স্থানে স্থানে "কঠোর সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ,—যাহা ইতিপূর্ব্বে 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহার প্রতিও বিলক্ষণ বক্র কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই সার্টি-ফিকেটের বাক্‌চাতুরীতে পাছে কেহ প্রবঞ্চিত হন, এই আশঙ্কায় পুনরুক্তি বাঁচাইয়া আমরা সংক্ষেপে 'ভারতী'র 'ভাবের ঘরে চুরি' দেখাইয়া দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়াছেন,—"যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না, তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে" কারণ, "বাংলা সাহিত্যের বয়স এখন কাঁচা।' কিন্তু কথাটা কি যুক্তি-সঙ্গত? প্রাচীন যুগের বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কথা ছাড়িয়া দিই, আধুনিক যুগেই যে সাহিত্যের কাব্য-কানন মধুসূদন,

হেম, নবীন, বিহারী, রবীন্দ্র, অক্ষয়, দেবেন্দ্র ও গিরিজা প্রভৃতির সঙ্গীত-লহরীতে মুখরিত, যে সাহিত্যের উপন্যাস-জগৎ বঙ্কিম, তারক, শিবনাথ, রমেশ, শ্রীশ ও সঞ্জীব প্রভৃতির আবির্ভাবে আলোকিত, যে সাহিত্যের নাট্য-রাজ্য দীনবন্ধু, গিরিশ, অমৃত, দ্বিজেন ও ক্ষীরোদ প্রভৃতির প্রভায় উজ্জ্বলীকৃত, সে সাহিত্যের বয়স কি এতই কাঁচা যে তাহা শাসনের উপযুক্ত হয় নাই? বঙ্কিমের উপন্যাস যাহারা পাঠ করিয়াছে, তাহারা কি বিনা আপত্তিতে 'প্রতিভাসুন্দরী'র তিক্তরস পান করিতে পারে? যাহারা 'বিল্বমঙ্গল' 'ভ্রান্তি' প্রভৃতি নাটক পড়িয়াছে, তাহারা কি বর্তমান 'ভারতী'-সম্পাদকের 'রুমেলা' পড়িয়া খুসী হইতে পারে? যাহারা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের রসাস্বাদন করিয়াছে, তাহারা কি মুখ বুজিয়া 'ভারতী'র এই সংখ্যায় প্রকাশিত "কালো-ছায়া" গল্পের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে? যাহারা ভূদেব বঙ্কিমের সন্দর্ভ পাঠে অভ্যস্থ, তাহারা কি আজ এই 'চলতি ভাষা' 'ভালো-মন্দ' প্রভৃতি 'nonsense' নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিতে পারে?—তাহা পারে না। পারে না বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর কঠোর সমালোচনার অভাব-বোধে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"সাহিত্যক্ষেত্র

অঙ্গনে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যের মধ্যে সংযমের, সৌন্দর্য্যের, শিষ্টতার এবং উচ্চ আদর্শের আবশ্যক কেহ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন না, স্বভাবিক বিচার-শক্তির সহিত নিরপেক্ষভাবে দণ্ড পুরস্কার বিধান করিবার কেহই নাই, পত্রে এবং সংবাদপত্রে উৎসাহ অত্যন্ত মুক্তহস্তে বিতরিত হইয়া থাকে এবং রাজকোষের শূন্য অবস্থায় কাগজের নোট যেরূপ অজস্র অথচ অনাদৃত হইয়া উঠে, এই সকল প্রাচুর্য্য বিশিষ্ট সমালোচনাও সাধারণের নিকট সেইরূপ প্রায় বিনামূল্যে বিক্রীত হয়।" তারপর 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন' প্রকাশকালেও রবীন্দ্রবাবু বীরত্ব সহকারে বলেন,—"আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচি-ভ্রংশ, সত্যের অপলাপ, এবং সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির শৈথিল্য, আমাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয়।"—'ভারতী'র লেখক—যিনি রবীন্দ্রবাবুর বাক্যকে বেদ বাক্য মনে করিয়া লড়াই করিতেছেন, তাঁহাকেই এখন জিজ্ঞাসা করি, রবীন্দ্রবাবুর উপরি-উদ্ধৃত উক্তিগুলির উত্তরে তিনি কি কিছু বলিতে পারেন? তিনি রবীন্দ্রনাথের দেখা-দেখি বাঙ্গালা সাহিত্যকে সম্প্রতি 'শিশু' 'শিশু' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথ নিজেই একদিন তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গা-

নীকে বুঝাইয়াছিলেন যে,বঙ্কিমের প্রতিভাস্পর্শে বঙ্গসাহিত্যের বন্ধ্যা-দশা ঘুচিযাছে।—'ভারতী'র লেথক বুঝাইয়া দিতে পারেন কি, 'শিশু'র বন্ধ্যা-দশা কেমন করিয়া ঘুচে ?

শুধু এইটুকু নহে। যে অভিমত, যে উদ্দেশ্য লইয়া 'ভারতী' জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইতেও সে আজ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ১২৮৫ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভারতী'র জন্মদাতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"দুঃখের বিষয় এই যে, ইদানিন্তন গ্রন্থ-সমূহে দোষের ভাগ এত অধিক যে সরলভাবে সমালোচনা করিতে গেলে ইচ্ছা না থাকিলেও কতকটা কঠোর হইয়া পড়িতে হয়। যদিও আমরা জানি যে ক্ষেত্র মাত্রই উর্ব্বরতা লাভ করিলে তাহাতে ভাল দ্রব্যের সহিত আগাছাও উৎপন্ন হয়—ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত নব স্বাধীনতার সময় অনেক ভাল কার্য্যের সহিত অনেক জঘন্য কার্য্যও সম্পাদিত হইয়াছিল—ইংরাজী সাহিত্যে ড্রাইডেন ও পোপ কর্ত্তৃক নবপ্রণালী উদ্ঘাটিত হইলে থিওবোল্ড্ ও সিবর প্রভৃতিও কবিতা রচনা করিয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়াছিল তবুও ঐ সকল অশুভ অপরিত্যাজ্য ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যে দমনীয় নহে, তাহা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যে

নবজীবন পাইয়া যে সকল অসার প্রলাপে দিক্‌বিদিক্‌ ধ্বনিত করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়া অন্যায় নহে।" —ইহার উত্তরেই বা 'ভারতী'র কি বলিবার আছে?

আরও হাসির কথা এই যে, যে সংখ্যার 'ভারতী' সমালোচনার রাজ্য হইতে অপ্রিয় সত্যকে দূর করিবার জন্য এত উপদেশ দিয়াছে, এত বকিয়াছে, সেই সংখ্যারই 'ভারতী'র সমালোচনার পৃষ্ঠায় দেখিলাম 'বিন্দা' নামে একখানি কবিতা-গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"এত ছাপ আঁটা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই কবিতাগুলির ভাবে, ভাষায় বা ছন্দে কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না। পঙ্গু ছন্দ, আড়ষ্টভাব ও নির্জ্জীব ভাষাই চোখে পড়িল। সেই মামুলি ভালবাসা আর 'প্রভু আমি অধম'—ইহারই ধূয়া চলিয়াছে।"—জিজ্ঞাসা করি, এই ছত্র কয়টি কি 'প্রিয় কথা'র পুষ্পাঞ্জলি? 'ভারতী'র উপদেশের মর্ম্ম এই যে, 'আমি যাহা বলি, তাহাই কর। আমি যাহা করি, তাহা দেখিও না।' কিন্তু এ আব্দার সাহিত্য-ক্ষেত্রে কে সহিবে? এখানেও রবীন্দ্রনাথের এই কথাটিই অমূল্য—"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

বিবিধ

কবি-জীবনী—

কবির জীবন-চরিতে কোনও প্রয়োজন নাই, এ কথাটা আর কখনও কোনও দেশের লোক বলিয়াছেন কি না জানি না; আমরা কিন্তু উহা রবীন্দ্রনাথের মুখেই প্রথম শুনিয়াছি। টেনিসনের জীবনী পড়িয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—"কবির জীবন মানুষের কি কাজে লাগিবে? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কি আছে? কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চে টাঙ্গাইয়া রাখিলে, ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়।"

এইরূপ একবার নহে। পরে তাঁহার "বারোয়ারি মঙ্গল" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেন,—'যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই। তাঁহার জীবন-চরিতে কাহার কি প্রয়োজন?"

ইহার পর "বঙ্গ ভাষার লেখক" গ্রন্থে তাঁহাকে যখন আত্ম-জীবনী লিখিতে অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি নিজের জীবন-কথা না লিখিয়া "কাব্যের মধ্য দিয়া তাঁহার কাছে

তাঁহার জীবনটা যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে," তাহাই বলিবার চেষ্টা করেন, এবং রচনার প্রারম্ভে বলেন,—"আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারো কোন লাভ নাই।"

কিন্তু এ সামান্য ব্যাপারেও রবীন্দ্রবাবু তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন-বিধায়িনী-প্রতিভার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কবির জীবনী লেখার বিরুদ্ধে অত কথা বলিয়া, অত উপদেশ দিয়া, শেষে নিজেই ঐ পথে ছুটিয়া গিয়াছেন। 'প্রৌঢ়ত্বের শিখরে' আসিয়া তিনি 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকরূপে নিজের 'জীবন স্মৃতি' লিখিতে আরম্ভ করেন; এবং পরে সেই লেখা সুবৃহৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিতও হইয়াছে। কবি "বঙ্গ ভাষার লেখক" গ্রন্থে বলিয়াছিলেন —"আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারো কোন লাভ নাই।" অথচ ছোট বেলায় তিনি কবে কোথায় বাম পায়ে লাফ মারিয়াছিলেন, সে খবরটুকুও তাঁহার এই "জীবন-স্মৃতি"তে লিখিতে ভুলিয়া যান নাই।

যে জিনিষে লাভ নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই জিনিষেই আবার লাভের লোভ

দেখাইয়া তিনি 'জীবন-স্মৃতি'র গোড়াতেই লিখিয়াছেন,— "স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্য্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভাল করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।"—আশ্চর্য্যের বিষয়, একথা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে মনে ছিল না! 'বিশ্বশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া নিজের' কথাটা কেমন করিয়া বলাইয়া লইয়াছেন, তাহা যখন তাঁহার বেশ ভাল করিয়া বলা শেষ হইল, তখন তাঁহার মনে পড়িল, কবির জীবন-কথা ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য হয়

সীতাদেবী—

সাক্ষাৎভাবে হিন্দুর দেব-দেবীকে গালি দিলে পাছে আইনের ঘূর্ণিপাকে পড়িতে হয়, শুনা যায়, এই ভয়ে পূর্ব্বে

নাকি পাদ্রী সাহেবেরা নানা রকম আজগুবি গল্প রচনা করিয়া গল্পের পাত্র-পাত্রীর দ্বারা হিন্দুর ধর্মকে,—হিন্দুর দেব-দেবীকে গালি দিত। রবীন্দ্রনাথও সম্প্রতি সেই সুবিধার পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যে জানকীকে হিন্দু দেবী বলিয়া, সতী বলিয়া হৃদয়ের পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই সতী-শিরোমণি সীতার সম্বন্ধে রবিবাবু তাঁহার এক উপন্যাসের নায়কের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—"যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলিয়া মনে করি, সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে সে আপনার অন্তঃপুরে না এনে যে অশোক বনে রেখেছিল—অত বড় বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সঙ্কোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজা করত"

যে দেশের মেয়েরা পাঁচ বৎসর বয়স হইতে 'ব্রতকথা'য় বলিতে শিখে, "সীতার মত সতী হব, রামের মত পতি পাব", সেই দেশেরই কবির কলম হইতে বাহির হইয়াছে—"সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজা করত।"—হৃদয়-হীনতার এমন দৃষ্টান্ত বুঝি কোনও কবিতে কখনও দেখা যায় নাই। কোনও পাদ্রী সাহেবের লেখাতেও

এমন কথা কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালা দেশ বলিয়া উহা ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে পশ্চিমে —থোড়াই দেশে ঐ কথা লিখিলে রবীন্দ্রনাথ আজ নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। যাহারা জানকীকে জননী—জগদীশ্বরী বলিয়া পূজা করে, তাহারা তাঁহার সতীত্বের উপর এমন কুৎসিৎ কটাক্ষ নীরবে সহ্য করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। আমরা অতি অধম, তাই সহ্য করিতেছি। তাই ঐ লেখার পরেও এ দেশে রবিবাবুর লেখা বিকাইতেছে! রবিবাবুর ন্যাকারও আমরা পরম তৃপ্তিতে গলাধঃকরণ করিতেছি!

সীতার সতীত্বের কথা এখানে বুঝাইতে যাইয়া ধৃষ্টতা করিব না। কাষ্ঠের আলো ধরিয়া চাঁদ দেখাইতে যাওয়া পাগলামীর পরিচায়ক। সীতার পাতিব্রত্যের মহিমা রবীন্দ্রনাথও যে আগে না বুঝিতেন, এমন নহে তাঁহারই ভূতপূর্ব্ব উপদেশে দেখিতে পাই,—"রামায়ণে যে সৌভ্রাত্র যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানা ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্ম্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।" তবে রবীন্দ্রের

ভক্তেরা যদি এখন বলেন যে, নারায়ণের ঐ পাতিব্রত্যের কথা কবি শূর্পনখার উদ্দেশেই লিখিয়াছেন—সীতার উদ্দেশে নহে!—তবে নাচার! সেদিন "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" নামে একখানি পুস্তকে পড়িতেছিলাম যে,—"রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি,—অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় মর্ম্মবাণীর প্রচারক।" পড়িয়া হাসি আসিল। ভাবিলাম, যে ব্যক্তি 'রাম-সীতার' উপর বক্র কটাক্ষ করেন, তিনি হিন্দুর মর্ম্মকথারই প্রচারক বটে!

রামচন্দ্র—

শুধু সীতা নহেন—রাম-চরিত্রের উপরেও কবি বিলক্ষণ বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন। সেদিন "হৈমন্তী" নামে এক গল্পের শেষে লিখিয়াছেন,—"যদি লোকধর্ম্মের কাছে সত্য ধর্ম্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা তাহা কি করিতে আছে? জান তোমরা, যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জ্জন দিবার দাবী করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জ্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন।"

একখানি উত্তরে ত্রিবেদী মহাশয়ের কথাই মনে পড়ে যে, "রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া কাজটা ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনায় আমার সাহস নাই সেই বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর ও কুসুমের অপেক্ষাও কোমল লোকোত্তর চরিত চিত্রপটে আঁকিবার চেষ্টা করিলে আমার লেখনী কম্পিত হয়, আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয়! সেই অলৌকিক মাহাত্ম্যের সম্মুখীন হইলে আমার ক্ষুদ্রতা তাহার জ্যোতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণী যাহাতে সংশয় প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বেরই পরিচয় দেয়—সেই ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তিনি সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীত্যাগ করেন নাই; তিনি আপনার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়াছিলেন; তিনি আপনার অর্দ্ধেক অঙ্গ ছিন্ন করিয়া হোমানলে আহুতি দিয়া আপনাকে হীন, আপনাকে ভগ্ন, আপনাকে শীর্ণ, আপনাকে অসম্পূর্ণ করিয়া সেই অসম্পূর্ণ আত্মটুকু ধর্ম্মের পরিচর্য্যার জন্য অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। ইহা লোকোত্তর কর্ম্ম—ইহা ধর্ম্ম—ইহার তত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে; সেই গুহার

অন্ধকার ভিন্ন করা তোমার আমার মত মূষিকের ও ছুচুন্দরের কার্য্য নহে। তোমার আমার সৌভাগ্য যে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই লোকোত্তর ধর্ম্মের আদর্শ দেখিতে পাইয়াছি।"

'নোবেলপ্রাইজ' পাইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রবাবু অবশ্য কবি-গুরু বাল্মীকিকে খোঁচা মারিবার সাহস করিতেন না। রামচন্দ্র সম্বন্ধে তিনিই লিখিয়াছিলেন,—"রামায়ণ সেই নর-চন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব্ব করিয়া মানুষ করেন নাই। মানুষই নিজ গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন" কিন্তু দেশশুদ্ধ লোকের শাহব পাইয়া, সৌভাগ্যের গাদায় বসিয়া রবীন্দ্রনাথ ঐ সব কথা আজ ভুলিয়া যাইতেছেন! আজ সমস্ত পৃথিবীটা তাঁহার নিকট মধুপর্কের বাটির চেয়ে ছোট।—আজ ব্যাস-বাল্মীকিকে তিনি তুড়ি দিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন! —ভাবিতেছেন তাঁহার কলমের খোঁচার উপরেই তাঁহাদের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে!

হিন্দু সভ্যতা—

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি এক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, হিন্দুরা মুসলমানের নিকট

আদব কায়দা, ভদ্রতা শিক্ষা করিয়াছে। তাঁহার "জাপান-যাত্রীর পত্রে" তিনি লিখিয়াছেন,—"কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাত রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় বলে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এই জন্য আদবকায়দা মুসলমানের। মনুতে পাওয়া যায়, মা, মাসী, মামা, পিসের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার কি রকম হবে;—কিন্তু সাধারণ ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত, তার বিধান নেই। এই জন্য জাত বিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্য, পশ্চিম ভারত, মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেচে "—কথাটা আনকোরা নূতন, কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু কথাটা কি স্ব্য সিদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ? সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহারের মহামন্ত্রস্বরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "সর্ব্বভূতময়োহি সঃ" প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বাক্য যে দেশ হইতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই দেশের লোকের কাছে 'বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত

দিকে', ইহা কি সম্ভব? যে দেশে "বসুধৈব কুটুম্বকা 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিকতার প্রবচন বহুকা হইতে প্রচলিত, সেই দেশের লোক 'জাত বিচারের বাহি মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্য মুসলমানের নিকট সেলা শিক্ষা করেছে,' ইহা কি স্বাভাবিক?

রবীন্দ্রনাথকে এখন একবার তাঁহার পুরাতন পুঁথি উল্টাইয়া দেখাই।—পৃথিবীতে যখন মুসলমানের নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত ছিল না, তখন হিন্দু সভ্যতা 'বাহিরের লোকের কাছে কিরূপ ভদ্রতা রক্ষ' করিয়া চলিত, তাহার পরিচয় তাঁহার পুরাতন পুঁথিতেই আছে। মনে পড়ে কি, তিনিই লিখিয়াছিলেন,—

"হিন্দু সভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য্য প্রকাণ্ড সমাজ— বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয়, জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশীয়, দ্রাবিড়ী তৈলাঙ্গী, নায়ার—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দু সমাজের একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে।" "চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান, হিয়োন্থ সাং যেমন অনায়াসে আত্মীয়ের ন্যায় ভারত

পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন, য়ুরোপে কখনো সেরূপ পারিতেন না। গ্রীক হউক, আরব হউক, চৈন হউক, সে জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করে না, বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোন কথা বলে না।"

ভগবান মনু "সাধারণ ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত, তার বিধান দেন নাই" বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অঙ্গে বিদ্রূপের বাণ মারিয়াছেন। কিন্তু মনু ত স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃশকাঃ।

পারদাপহ্লব শ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥

অর্থাৎ "'পৌণ্ড্রক' 'দ্রাবিড়' 'কাম্বোজ,' 'জবন,' 'শক,' পারদ,' পহ্লব,' 'চীন,' 'কিরাত,' 'দরদ,' এবং 'খশ,'—এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্বলাভ করিয়াছেন (বঙ্গবাসীর মনুসংহিতা)—এদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিতেছেন যে "মনুতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কি রকম হবে।" অতএব, সাধারণ ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের

ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত, তার বিধান মনুতে নেই’ বলিয়া দুঃখ করিলে কি বিষম ভুল বলা হয় না ?

এই প্রবন্ধের আর একস্থানে শ্লেষের সুরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—“আমাদের...... অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যে রকম, অর্থাৎ দিগম্বরের সুন্দর অনুকরণ ” অথচ এই রবীন্দ্রনাথই ইতিপূর্ব্বে একদিন লিখিয়াছিলেন,—“আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষ সমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয় আঘাত করি না।”—ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

ইতিহাস—

কিছুদিন হইল, রবীন্দ্র বাবু তাঁহার “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” শীর্ষক রচনায় সীতাকে লইয়া একটা প্রকাণ্ড রূপকের কল্পনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিতে চাহিতেছেন যে, সীতা মানবী নহেন, “হল চালন রেখা মাত্র ”

কিন্তু বৎসর দশ পূর্ব্বে “সাহিত্য-সৃষ্টি’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনিই আবার লিখিয়াছিলেন,—“প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে জনক যে আর্য্য সভ্যতার একজন ধুরন্ধর ছিলেন,

নানা জনপ্রবাদে সে কথার সমর্থন করে। ভারতবর্ষে কৃষি বিস্তারে তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কন্যারও নাম রাখিয়াছিলেন সীতা পণ করিয়াছিলেন, যে বীর ধনুক ভাঙ্গিয়া অসামান্য বলের পরিচয় দিবে, তাহাকেই কন্যা দিবেন।" ইত্যাদি—

উপরের মত দুইটা পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা মারিতেছে না কি? রবীন্দ্র বাবুর লেখায় এইরূপ ছোট খাটো পরস্পর-বিরুদ্ধ মত যে কত আছে; তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু কাগজের এই দুর্মূল্যের বাজারে সেগুলো সংগ্রহ করিয়া আর পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পড়িলেই পাঠকের মুখ হইতে স্বতঃই বাহির হইবে—"Oh Inconsistency! Thy name is Rabindranath!

সমাপ্ত।